হারিয়ে গেল কত হারাধন

মিজানুর রহমান তরুণ

পুর্বের সংখ্যার পর – – – (আগের লেখাটি পড়তে এখানে টোকামারুন)

আব্বাকে যেমন দেখেছি, আব্বার কথা শুনেছিও অনেক— 'মা'-র কাছে, আত্মীয়-পরিজনদের কাছে, প্রতিবেশীদের কাছে। দিন-মজুর, রিক্সাচালক, সব্জী-মাছ-মাংশ ও মুদী দোকানীর কাছে। আব্বার সম্মানে রিক্সাচালক ভাড়া নিতে চায়নি। সব্জীওয়ালা ওজনে বেশী দিয়েও কম দাম রেখেছে। মাছওয়ালা, মাংশবিক্রেতারাও তা-ই। তারা সবাই শ্রদ্ধাভরে আব্বাকে আজো স্মরণ করে 'গরীবের ডাক্তার' বলে।

বাঙ্গালীদের গড় উচ্চতার চেয়ে আব্বা অনেকটা বেশী উচ্চতাই পেয়েছিলেন। ছিলেন ক্রীড়াবিদ। উচ্চ বিদ্যালয় থেকে কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পাঠ্যকালীন দৌড় ও সাইকেল রেসে নিয়মিত পুরষ্কার পেয়েছেন। সে নিদর্শনগুলি আমাদের বাড়ীতে একটি কাচের আলমারিতে সযত্নে রক্ষিত ছিল। একাত্তরে পাক-হানাদারদের লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগের কারণে আমাদের পারিবারিক ইতিহাসের কোন নিদর্শনই আর নেই। যেমন নেই আব্বা ও আমাদের ছোটবেলার সাদাকালো ছবি।

একদিন রাতে দূর গ্রামাঞ্চল থেকে একজন মুমূর্ষু রুগী দেখে ফিরে আসতে আব্বার অনেক রাত হয়ে যায়। গরুগাড়ী চলা পথ ছিল এবড়ো-থেবড়ো। হঠাৎ চার-পাঁচজন মুখোশধারী দুর্বৃত্ত আব্বার পথ রোধ করে। আব্বা বিপদ আঁচ করতে পেরে শ'খানেক গজ আরো আগে থেকেই দ্রুত সাইকেল চালিয়ে দুর্বৃত্ত-ব্যুহ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে পেছন থেকে এক দুর্বৃত্তের লাঠির আঘাত তাঁকে গুরুতর আহত করেছিল। চিকিৎসায় কিছুটা ভাল হলেও আমৃত্যু সে ব্যথা তিনি বহন করেছিলেন।

বিংশ শতকের ছয় দশকের প্রথম দিকে আমাদের জেলা শহরে সংঘটিত হল তথাকথিত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা। ইংরেজী নাম Riot। পরে প্রকাশ হল Riot-টি ছিল একতরফা। পাকিস্তান আমলে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিটি জেলা শহরে ডিসি, এসডিও, এসপি পদগুলিতে নিয়োগ পেত অবাঙ্গালী। আমাদের মফঃস্বল শহরে উল্লিখিত সরকারী কর্মকর্তারা অবাঙ্গালী তো ছিলই, এমনকি মুসলিম লীগের এক নেতা ছিল 'জায়েদী খান' নামে। তার পোষ্য ছিল বাঙ্গালী কিছু গুন্ডা বাহিনী। তাদের-ই সৃষ্ট ছিল ঐ একতরফা দাঙ্গা (Riot)। উদ্দেশ্যঃ হিন্দু সম্প্রদায়কে ভাগিয়ে তাঁদের জমি ও সম্পত্তি দখল করা। পরিকল্পিত ঐ দাঙ্গা মাত্র একটি রাত স্থায়ী হয়েছিল। আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য কিছু হিন্দু বাড়ীঘরে আগুন লাগানো হয়েছিল। কিন্তু লুটপাট হয়েছিল প্রায় প্রতিটি বাড়ীতে। হিন্দু মানুষেরা প্রতিবেশী মুসলমান মানুষের বাড়ীতে আশ্রয় নেওয়াতে একটিমাত্র প্রাণহানি ঘটেছিল। আমাদের বাড়ীর শোবার ঘর, উঠোন, রান্নাঘর- এমনকি পয়খানাতেও ঠাসা ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষে।

আব্বা তাঁর বিশাল দেহ নিয়ে লাঠিহাতে সদর গেটের বাইরে পাহারা দিয়েছিলেন সারারাত। দু'চারজন মুখোশধারী গুন্ডা খোঁজ করতেও এসেছিল আমাদের বাড়ীতে, কোন হিন্দু লুকিয়ে আছে কিনা। আব্বা তাদের বলেছিলেন, কেউ যাতে ঢুকতে না পারে তাইতো আমি এখানে পাহারা দিচ্ছি। আব্বার রুদ্রমূর্ত্তি দেখে আর কেউ কাছে ভিঁড়তে সাহস করেনি।

উৎকন্ঠার রাত পার হলে পরের দিন সব ঠান্ডা। মাঝখান থেকে কিছু হিন্দু পরিবার সর্বস্ব ত্যাগ করে প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে ওপার বাংলায় চলে গেল। আমি হারালাম আমার বাল্যকালের সহপাঠি বন্ধুদের। নম্র, ভদ্র, সুদর্শন ও শান্ত প্রকৃতির বিমল, পরিমল ও সন্তোষকে। আমাদের স্কুল হারাল সর্বজন শ্রদ্ধেয় সৌম্যকান্তি ইংরেজীতে সুপন্ডিত প্রধান সহকারী শিক্ষক বিজয় বাবুকে। কেউ জানতেও পারল না আমাদের জেলা শহরের কত কৃতি ব্যক্তিত্ব, যেমন খেলোয়াড়, কন্ঠশিল্পী, বাদক, নাট্যাভিনেতা, স্বর্ণকার, কুম্ভকার, কর্মকার কয়েক পুরুষের আবাসস্থল নিজ জন্মভূমি ত্যাগ করে নীরবে নিঃশব্দে ওপার বাংলায় চলে গেল। আমার ব্যক্তিগত ব্যাপক ক্ষতি হল বিমল ও সন্তোষ চলে যাওয়াতে। ওদের দু'জনের বাড়ীতে হত সঙ্গীত-চর্চা। ছিল বাদ্যযন্ত্র। ছুটির দিনে মাঝে মধ্যে আমারও সুযোগ মিলত গানের আসরে।

সেখানে আসতেন আমাদের শহরের খ্যাতনামা রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী স্কুল শিক্ষিকা মঞ্জুশ্রী দত্ত। মঞ্জুশ্রী দিদি যখন গাইতেন, তন্ময় হয়ে শুনত সবাই— পরিবেশটাই হয়ে যেত শান্ত মধুর। মনে পড়ে স্বরচিত গান গেয়ে সুপরিচিত বিরুদার কথা। তাঁর একটি গানের কলি এখনও মাঝে মাঝে গেয়ে উঠি—

সাহেবের পায়ে নমস্কার

দেখলাম ভাই ঘোর কলিতে

এ জগতে ভাল-মন্দের নাই বিচার

সাহেবের পায়ে নমস্কার॥

সত্যিকার অর্থেই অর্ধ শতক বছর থেকে ভাল-মন্দের অবিচারে, এখনো আমরা জর্জরিত। লোভ, ক্ষোভ, ক্রোধ, লালসায় এখনো আমরা ভাল-মন্দের বিচার করতে শিখিনি। সে সময়ে আমাদের ছোট মফঃস্বল শহরে সবাই সৌহার্দ-সম্প্রীতি নিয়ে বসবাস করতাম। ধর্ম নিয়ে, ধর্মের আচার অনুষ্ঠান নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি দেখিনি। স্কুলের মিলাদুন্নবী, স্বরস্বতী পুজা মিলেমিশে পালিত হত। ঈদের সময় পথে দেখা হলেই কুশলাদি, কোলাকুলির বাছ-বিচার ছিল না। পুজা-পার্বনে কাকীমাদের অন্দর মহলে হানা দিয়ে ভোগে ভাগ বসাতাম। তেমনি ঈদে-মুহররমে খিচুড়ি-মাংশ, চালের রুটি ও হালুয়ার জন্য হারাধন, কমল, বিমল, পরিমল, সন্তোষ ও পরিতোষের জন্য আমার ''মা''র দ্বার ছিল উন্মুক্ত। রথের মেলায় রথ টানা চড়ক পুজায় হাজরা খেলায় সারা শহরবাসীর ছিল আনন্দমেলা। কে হিন্দু, কে খৃষ্টান, কে বৌদ্ধ, কে মুসলমান— তার কোনো হিসাব ছিল না। তখন হয়তো আমরা সবাই কিছুটা মানুষ ছিলাম। স্বচক্ষে দেখলাম ধর্মীয় গ্যাঁড়াকলে সামাজিক অবক্ষয়।

যা হবার নয়, তা-ই হল। পিতৃবিহীন সংসারের বোঝা ঘাড়ে এল। ‘‘মা’’ যেমন করে লেখাপড়ায় মন দেবার কথা বলেন, ঠিক তেমন করে সাংসারিক নানান কাজকর্মের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। দু’কূল রক্ষায় স্কুল পরীক্ষার ফলাফল অতি সাধারণ মান নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে শ্রেণী ডিঙ্গোতে লাগলাম। স্কুলের সবচেয়ে কড়া বাংলা পন্ডিত স্যারের বেতের বাড়ি প্রায়ই হাতের তালুতে জুটতে লাগল। স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দু’টি তিনটি পুরষ্কার প্রাপ্তি আমার প্রায় বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। এখন আমি শুধুই দর্শক। জেলা শহরের স্কুলগুলির মধ্যে সেরা জুনিয়র গোল রক্ষক, রক্ষা শক্তি হারিয়ে ফেললাম। ক্রিকেট মাঠ থেকে Bold Out হয়ে গেলাম।

প্রধান শিক্ষক আব্বার সুনাম ও সম্মানে বিনা বেতনে স্কুলে অধ্যয়নের সুযোগ করে দিলেও, আমি তাঁর সম্মান রাখতে পারছিলাম না। আমার এক ফুফাতো বোনের স্বামী ছিলেন নামকরা প্রাইভেট টিউটর। ‘‘মা’’ বলে-কয়ে ব্যবস্থা করে দিলেন, প্রতিদিন প্রায় দু’মাইল পথ পায়ে হেঁটে, সকাল ৭টা থেকে ৯টা পর্যন্ত, উনার বাড়ীতে পড়তে আসা অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে পাঠ শেষ করে সরাসরি স্কুলে যাওয়া। স্কুল শেষে মায়ের দেওয়া এক টাকা ও ফর্দ অনুসারে বাজার করে ঘরে ফেরা। ফুফাতো বোন বেণীবু ও শিক্ষক দুলাভাই কাদের বক্স মহাশয়ের অবদান ভোলার নয়। পাঠ শেষে শিক্ষক দুলাভাইয়ের সঙ্গে, গরম ডালভাত-তরকারী খেয়ে একসঙ্গে স্কুলে আসতাম। বৃষ্টি-বাদলে রিক্সায়। তখন থেকেই লেখাপড়ায় কিছুটা গতি এল। বলা বাহুল্য, পিতার কক্ষপথে যে গতি ছিল, এ গতি সে গতি নয়। (চলবে)

মিজানুর রহমান তরুনের আগের লেখাগুলো পড়তে এখানে টোকা মারুন